“সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত। সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না, এই সার নীতি যার, সেই একমাত্র বিশ্বজয়ী হইতে পারে।”
যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ

মায়ের ডাক
MAYER DAK

“সত্যকে আজ হত্যা করে
অত্যাচারীর খাঁড়ায়
নেই কিরে কেউ সত্য সাধক
বুক খুলে আজ দাঁড়ায়”
—নজরুল

মাসিক বুলেটিন DL. No. 129/2000 E-mail : subhas.chkrbrity@rediffmail.com ফোন নং ঃ ৯২৩৯৭৬৯৯৩৮ জুলাই ২০১০ মূল্যঃ ১ টাকা

আওয়ামী লীগ পৌর কমিশনারদের হাতে নির্যাতিত ভৈরব কালীমন্দিরের সেবাইত গোপাল চক্রবর্ত্তী

ভৈরব দুর্গামন্দিরের সেবাইত কালীপদ চক্রবর্তী (৩৫) মুসলিম দুর্বৃত্তর ছুরিকাঘাতে নিহত

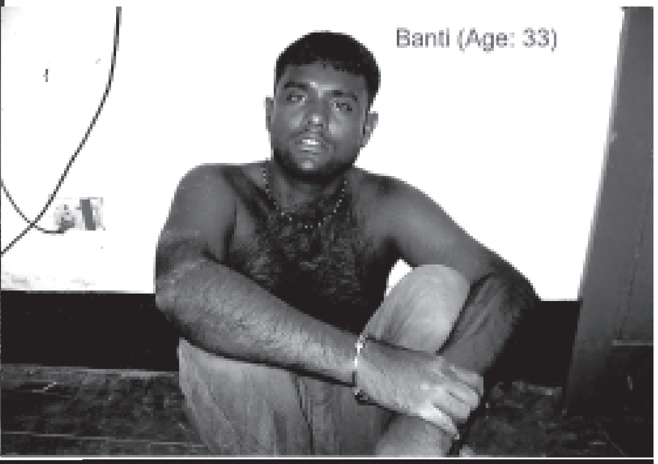

কালীপদ চক্রবর্তী হত্যাকারী সন্ত্রাসী মহম্মদ বান্টি মিঞা

কালিমন্দিরে সেবায়েতকে গাছে বেঁধে অমানুষিক নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব শহরের কেন্দ্রস্থলে কালিমন্দিরের সেবায়েত গোপাল চক্রবর্তী (৪৫) কে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ভৈরব পৌর চেয়ারম্যানের নির্দেশে কতিপয় পৌর কমিশনার সংশ্লিষ্ট মন্দির থেকে জোরপূর্বক ধরে এনে পৌর কার্যালয় প্রাঙ্গণে গাছে বেঁধে বেধড়ক পিটিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ সেবায়েত গোপাল চক্রবর্তীকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করেছে। গত ১ ফেব্রুয়ারী বেলা ১টায় সৃষ্ট ঘটনা শত শত লোক প্রত্যক্ষ করেছে।

কারণ হিসেবে জানা গেছে, পৌরসভার রাস্তা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৬০ বছরের পুরানো কালিমন্দিরটি আংশিক ভাঙার দাবী জানায়। সংশ্লিষ্ট মন্দির সেবায়েত গোপাল চক্রবর্তী মন্দির রক্ষায় ভৈরব প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন এবং মামলার আশ্রয় নেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ নজরুল ইসলাম মামলার তদন্ত করে যাবার পর পরই ভৈরব পৌরসভার মাসিক সভা চলাকালীন সময়ে পৌর চেয়ারম্যানের নির্দেশে পৌরসভার কতিপয় কমিশনার সদলবলে মন্দিরের সেবায়েত গোপাল চক্রবর্তীকে জোরপূর্বক টেনে-হেঁচড়ে বীরদর্পে ধরে এনে এ অমানবিক ঘটনা ঘটায়। সেবায়েত গোপাল চক্রবর্তী আহতবস্থায় পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। পৌর চেয়ারম্যান এডভোকেট ফখরুল আলম আক্কাসহ ঘটনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়েছে।

যশোরে হিন্দু স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের ভিডিও সিডি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ যশোর সদর উপজেলার একটি গ্রামের এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের দৃশ্য ধারণকৃত শত শত ভিডিও সিডি বাজারে ও মোবাইল ফোনে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় এলাকার তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের গরিব ওই মেয়েকে ধর্ষণ এবং ওই দৃশ্য ভিডিও করে বাজারে ছাড়া নিয়ে জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, মহিলা পরিষদ ও আইন সহায়তা সংগঠন ব্লাস্টের নেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ওই ছাত্রীর পরিবার ও গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায়, তাকে গ্রামের মনিরার বাড়িতে আটকে রেখে শুকুর নামে এক যুবক ধর্ষণ করে। আর ভিডিওতে ধর্ষণের এ দৃশ্য রফিকুল নামে আরেক যুবক ধারণ করে। গত ১৪ এপ্রিল সকালে এ ঘটনা ঘটে। এরপর ভিডিওচিত্র সিডি করে তারা বাজারে ও মোবাইল ফোনে ছড়িয়ে দেয়। কাউকে কিছু বললে মেরে ফেলা হবে বলে ওই স্কুলছাত্রীকে অভিযুক্তরা হুমকি দেয়। সম্প্রতি সিডি প্রকাশের ঘটনায় বিষয়টি জানাজানি হয়। ৩ জুন জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতারা সিডিটি হাতে পায়। এরপর বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। কিন্তু এরই মধ্যে অভিযুক্ত শুকুর, রফিকুল ও মনিরা বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করেছে।

ভৈরবে মন্দিরের সেবায়েত খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মন্দিরের সেবায়েত কালিপদ চক্রবর্তী (৩৫) খুন হয়েছেন। গত ১লা জুন, '১০ রাত সাড়ে সাতটার দিকে দু'জন দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে ভৈরব পৌর শহরের কাঠ বাজার এলাকায় তিনি খুন হন। এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত ভৈরব পৌর শহরের ভৈরবপুর দক্ষিণপাড়ার মহম্মদ বান্টি মিঞা নামে চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পৌর শহর কালিমন্দিরের সেবায়েত কালিপদ চক্রবর্তী রাত সাতটার দিকে কাঠ বাজারের লিটনের চায়ের দোকানে বসেছিলেন।

এমন সময় সন্ত্রাসী বান্টি এক সহযোগীকে নিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে কালিপদ চক্রবর্তীর সাথে কথা কাটাকাটি করে। এক পর্যায়ে ছুরিকাঘাত করে চলে যায়। উপস্থিত লোকজন হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই কালিপদের মৃত্যু হয়। নিহতের ভাই লক্ষণ চক্রবর্তী জানান, মৃত্যুর আগে কালিপদ তাদের স্পষ্ট করে বলেছেন—ভৈরব পৌর শহরের ভৈরবপুর দক্ষিণপাড়ার বান্টি ও তার এক সহযোগী কালিপদকে ছুরিকাঘাত করে। কি কারণে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে কালিপদ মৃত্যুর আগে বলে যেতে পারেননি। এমনকি তারাও ধারণা করতে পারছেন না। এই ঘটনার পর ভৈরব বাজারের কাঠ ও টিন বাজার এলাকার অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান কবির জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বান্টি নামে এক যুবক কালিপদ চক্রবর্তীকে ছুরিকাঘাত করেছে। বান্টি ভৈরব বাসস্ট্যাণ্ডে এসে রাত নয়টার দিকে বাসযোগে পালিয়ে যাবার সময় আমরা তাকে গ্রেফতার করি। খুনের প্রমাণ রক্তমাখা গায়ের জামা আটককরা হয়েছে।

মানিকগঞ্জ ইসলামী জঙ্গীদের অভয়ারণ্য

নিঃ প্রঃ—মানিকগঞ্জ ইসলামী জঙ্গীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। জেলার সাটুরিয়া, সিংগাঈর, শিবালয়, ঘিওর, হরিরামপুর ও দৌলতপুর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলি এখন জঙ্গীদের মুক্তাঞ্চল বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। ধলেশ্বরী, পদ্মা ও যমুনা নদীর তীরবর্তী চরাঞ্চলে জঙ্গীরা মজবুত ঘাটি গড়ে তুলেছে। মানিকগঞ্জ জেলাকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী টাঙ্গাইল, পাবনা, রাজবাড়ী, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ ও ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গীরা গোপনে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যমুনা ও পদ্মা নদীর অপর দিকে পাবনা, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর জেলার উত্তর পূর্ব দিকে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর ও মির্জাপুর উপজেলা। এলাকায় রাস্তাঘাট এখনও পর্যন্ত অনুন্নত। বর্ষায় রাস্তা থাকে ৮ থেকে ৯ ফুট জলের তলায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা ওই জেলার বহু এলাকায় ঢুকতে পারে নাই এই কারণে। সেই সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তাঞ্চল অবাধ বিচরন ক্ষেত্রে পরিণত করে ওই সমস্ত এলাকায়। ১৯৭১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম সপ্তাহে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ক্যাপটেন হালিম চৌধুরী, আওয়ামী লিগের মোসলেম উদ্দিন খান (হাবু মিয়া) ও কামাল হোসেন স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্বে মানিকগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। ঘিওর থানার সিংজুরী নামক গ্রামে হিন্দু বাসিন্দা প্রবল ডাক্তারের বাড়িতে মতিলাল সেন (ছানা বাবু) ও তার দুই সহযোগী গোপন অস্ত্রাগার গড়ে তোলেন। সপ্তাহে তিনদিন রাতের অন্ধকারে ওই গ্রামের পার্শ্ববর্তী ফাঁকা মাঠে একটি শুকনো পুকুরের মধ্যে ক্যাপটেন হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে শুরু হয়ে যায় রাইফেল ট্রেনিং।

মানিকগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী হিন্দু, মুসলিম ধর্মীয় দিকে আবেগ প্রবণ। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দিকে জঙ্গীদের আত্মগোপন করে থাকা অথবা কোনদিকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য অতি উত্তম স্থান হিসেবেই অংক কষে ইসলামী জঙ্গীরা ঘাটিতে পরিণত করেছে। বিষয়টি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টিতে থাকলেও অদৃশ্য কারণে নীরব। ফলে জঙ্গীরা বিভিন্ন গ্রামে সভায় ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদ করার জন্য মুসলিম যুব সমাজের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে চীন ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা

পাকিস্তান-বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে শত শত ইসলামী জঙ্গী সংগঠন। এদের হামলায় ধবংস হচ্ছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনাস্থল, বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত। লুন্ঠিত হচ্ছে নারীর সম্ভ্রম। পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে নীরিহ শান্তিপ্রিয় মানুষ। গণতন্ত্র, মানবতা পদদলিত করে চালিয়ে যাচ্ছে আগ্রাসনতন্ত্র ও হিংস্রতা। মানুষ, রাষ্ট্র ও নিরাপত্তা বাহিনী সবই আছে। সবাই যেন অসার ক্লান্ত দেহ নিয়ে বিরাজ করছেন এই ভূখণ্ডে। তাণ্ডব আর রক্তস্রোত দেখতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। রাষ্ট্র নেতাদের মুখে এই নির্মমতার বিরুদ্ধে রুটিন মাফিক নিন্দা বানী। জনগণের মুখে হতাশার বাণী। আমাদের অবস্থা দেখে হিংস্র পশুরদল হাজার গুণ বেশী উল্লসিত। তাই হিংস্র পশুদের থাবা দেশ থেকে বিদেশের মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের কোন দেশ বা শান্তিপ্রিয় মানুষ এদের হিংস্র থাবা থেকে নিরাপদ নয়।

আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে পাকিস্থানের অনুকরণে গড়ে উঠেছে, ইসলামী জঙ্গি সংগঠন 'জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জে এম বি)। সমগ্র বাংলাদেশকে নয়টি বিভাগে ভাগ করে শুরু করেছে তাদের সক্রিয় কার্যকলাপ। নয়টি বিভাগে ৬৪ টি জেলায় চারশত সর্বক্ষণ কর্মী কর্মরত। ৫০ হাজার রয়েছে তাদের আন্তরিক সমর্থক। সাংগঠনিক চিঠিপত্র আদান প্রদান হয় সাংকেতিক ভাষায়। একদিনে, একই সময় সমগ্র বাংলাদেশে ৪০০ বোমা ফাটিয়ে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি ঘুড়িয়ে নিয়েছিল বাংলাদেশের দিকে। জে এম বির পাঁচ শীর্ষ নেতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে প্রাণদণ্ড দিলেও এই সংগঠনের গতি স্তব্দ করতে পারে নাই বাংলাদেশ সরকার। বরং তারা সীমান্তের কাটা তারের বেড়া অতিক্রম করে ঢুকে পড়েছে ভারতে। পশ্চি মবঙ্গের সীমান্ত জেলা মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় তাদের সাংগঠনিক প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এই তিন জেলায় জেত্রমরির ১০০ সর্বক্ষণ কর্মী, ১০ হাজার আন্তরিক সমর্থক সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া এই সংগঠনের শীর্ষ নেতা মাওলানা সাইদুর রহমান বাংলাদেশ পুলিশকে এসব তথ্য জানিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা সাতটি মাদ্রাসা গড়েছে পশ্চি ম বাংলায়। পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগ আই এস আই সরবরাহকৃত ভারতীয় জাল টাকা, মাদক, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরকের ব্যবসা ফেঁদেছে ভারতে। লাভের টাকা দিয়ে ইসলামী সন্ত্রাস রপ্তানী করছে দেশ বিদেশে। মাঝে মধ্যেই হুঁঙ্কার দিচ্ছে "লালবাগ থেকে লালকেল্লা লাইলাহা ইলেল্লা।" এর অর্থ ঢাকার লালবাগ থেকে দিল্লীর লালকেল্লা পর্যন্ত ইসলামী করন করা হবে। গত ১৩ জানুয়ারী ঢাকায় মুক্তাঙ্গনে হাজার হাজার মানুষের প্রকাশ্য জনসভায় বাংলাদেশ রাইফেলসের প্রাক্তন মহাপরিচালক আ ল ম ফজলুল রহমান ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চি মবঙ্গ দখলের ডাক দিয়েছে। ভারতের এসমস্ত রাজ্য দখল করতে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধ করতে চান। এবং এই যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিতে ও প্রস্তুত।

(চলবে)

স্বাধীনতার অন্তরালে

প্রশান্ত কুমার শর্মা

কে বলে আমরা হয়েছি স্বাধীন আজও আছি পরাধীন।
মুখোশ পরা মানুষগুলো তাই, নাচছে তাধিন ধিন।।
পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাধা, আমরা বাংলাদেশী উদ্বাস্তু দল।
ব্যাঘ্র হুংকারে করিব ছিন্ন, ঐ লৌহ শৃঙ্খল।।
অনুপ্রবেশের কলঙ্ক লেপন করেছে আমাদের সারা গায়।
এই অপমান সহিব না মোরা, নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ আছে মোদের সহায়।।
স্বাধীনতার অন্তরালে বসিয়া আছে, আমাদের এই সরকার।
এই দেশেরই মানুষ আমরা, আমাদের দিতেই হবে অধিকার।।
মুখোশধারী স্বার্থান্বেশীদল, করিয়াছে ভারত ভাগ।
তাহারই জেরে করিতে হইল মোদের জন্মভূমির মায়া ত্যাগ।।
ফরটিন ফরেন এ্যাক্ট আইন করেছে, ৭১এর মানুষের জন্য।
দিকে দিকে তাই পুলিশ নেমেছে, অনুপ্রবেশদের ধরতে।।
অখণ্ড ভারতের মানুষ আমরা, আমরা বাংলাদেশী।
ভারত আমার, আমরা ভারতের, আমরা ভারতবাসী।।
নইকো মোরা অনুপ্রবেশকারী, নইতো অপরাধী।
শরণার্থী স্বীকৃতি দিতেই হবে, এটাই আমাদের দাবী।।

সংখ্যাগুরুর দখল-মানসিকতা

আবুল মোমেন

বাঘাইছড়ি ও খাগড়াছড়ির ঘটনার পর মনে হচ্ছে এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশী ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী-সমূহের প্রতি মনোভাব ও তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের মান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায়। ১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে ধরলে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সম্পর্ক ও দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্নটি জরুরি ও জোরালোভাবে উঠে আসবে। কারণ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তান তার জন্মকালীন এই ধর্মীয় পক্ষপাত ও বিপক্ষতার আদর্শিক ভূমিকার জন্যই সংখ্যালঘুর আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়নি।

রাঙামাটিতে আদিবাসীদের পাঁচশত বাড়িপুড়িয়ে দিয়েছে মুসলিম দুর্বৃত্তরা

১৯৪৬-এ কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গার পর বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে সন্দেহ ও আস্থাহীনতা জোরদার হয়। সাধারণত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চ লে ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের সহাবস্থানের সংস্কৃতি অনেক জোরালো ও বিকাশমান থাকে এবং বাংলায় তার ঐতিহ্যও সুদীর্ঘ। কিন্তু নোয়াখালীর দাঙ্গা সে ধারায় ক্ষত সৃষ্টি করে। কেবল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পটভূমিতে এক বছরেই প্রায় ১১ লাখ হিন্দু এ দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। এদের অধিকাংশই ছিল আতঙ্কিত, সর্বস্ব হারানো ছিন্নমূল উদ্বাস্তু—যদিও এদের মধ্যে সাড়ে তিন লাখ ছিল গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, দুই লাখের মতো স্বচ্ছল কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর মানুষ। দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গে (অর্থাৎ বাংলাদেশে) শতকরা ২৯ ভাগ সংখ্যালঘুর বসবাস ছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালের জনসংখ্যা জরিপে দেখা যায় সে সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২২ ভাগে। এভাবে দশকওয়ারি জনসংখ্যা জরিপগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে তাতে সংখ্যালঘুর অনুপাত ধারাবাহিকভাবে কমেছে। কমতে কমতে সরকারি হিসাবে এ সংখ্যা এখন শতকরা ১২ ভাগের মতো। এই পরিসংখ্যানগুলো বিশ্লেষণ করে গত ৬০ বছরে এ দেশ থেকে কত সংখ্যালঘু দেশত্যাগ করেছে তার মোট হিসাব বের করা সম্ভব এবং তা যে বিরাট একটি সংখ্যা হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় হলো, সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ এখনো অব্যাহত রয়েছে। রাষ্ট্র এবং সমাজ এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয়, প্রতিকারে সচেষ্ট নয় এবং অবস্থার শিকার যারা, তাদের প্রতি প্রয়োজনীয় সংবেদনশীল নয়।

এ বিষয়টিকে ভারতের হিদু-মুসলিম দাঙ্গার সংখ্যাগত ও ব্যাপকতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দাঙ্গা-পরিস্থিতির বিচারে মূল্যায়ন করার মানসিকতা দেখা গেছে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্র যেহেতু সাম্প্রদায়িক নয়, আইন ও প্রতিষ্ঠান যেহেতু সবার সমানাধিকার রক্ষায় স্পষ্টভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ, তাই সামাজিক যে সাম্প্রদায়িকতা, তাকে মোকাবিলা করার মতো সাহস ও উদ্দীপনা মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুরা পেয়ে থাকে। তাতে দেখা যায়, ভারতবর্ষে গত ৬০ বছরে ছোট-বড় অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলেও '৪৭ ও '৫০ এবং '৬৪-র দাঙ্গা ব্যতীত অন্য সময়ে ধারাবাহিক দেশত্যাগের ঘটনা ভারতের দিক থেকে ঘটেনি। বাংলাদেশের বহির্মুখী ও দেশমুখী অভিবাসনের পরিসংখ্যান পেলে তা থেকে বিষয়টি সহজেই পরিষ্কার হবে। তবে সমাজের দিকে চোখ রাখলেও প্রবণতা কোন দিকে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির ওপর সৃষ্টি হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সংখ্যালঘুর আস্থা ও মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য সরকারের বহু পদক্ষেপকেই দায়ী করা যাবে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পটভূমিতে পাকিস্তান ও ভারতের তৎকালীন দুই প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও লিয়াকত আলী খানের মধ্যে উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের ধর্ম-নির্বিশেষে নাগরিক সমানাধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও পাকিস্তান সরকার সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়নি। বরং বিপরীত ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে, যাতে এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মনোবল আরও ভেঙে পড়ে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের আইনসভায় এমন দুটি আইন পাস করা হয়, যাতে সংখ্যা-লঘুদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হুমকির সম্মুখীন হয়। এ দুটো আইন হচ্ছে—ইস্টবেঙ্গল ইভাকুই প্রোপার্টি (রেস্টোরেশন অব পোজেশন) অ্যা* অব ১৯৫১ এবং ইস্টবেঙ্গল ইভাকুইস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব ইমমুভেবল প্রোপার্টি) অ্যা* অব ১৯৫১।

এখানে একটা কথা স্মরণ করা দরকার যে বাংলায় (এবং ভারতবর্ষেও) ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করার ফলে চাকরি, আয়-উপার্জন ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানার দিক থেকে হিন্দুসমাজ মুসলমানদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। ফলে সংখ্যাগত দিক থেকে পূর্ববঙ্গে হিন্দু সংখ্যালঘু হলেও তার হাতে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল আনুপাতিক এবং সামগ্রিক উভয় হিসেবেই বেশি।

এদিকে দেশভাগের ফলে অনাস্থা ও আতঙ্কের মধ্যে ভিটেমাটি ছেড়ে দেশত্যাগ এবং সহায়-সম্পত্তি নিয়ে চরম ভোগান্তির অশনিসংকেত প্রদানকারী এই দুটি আইন তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে অসহায় মানুষের দেশত্যাগ সংখ্যাগুরু সমাজের মধ্যে একশ্রেণীর উচ্চভিলাষী নৈতিকতা-বর্জিত মানুষেরও জন্ম দেয়, যারা সস্তায় কিংবা গায়ের জোরে সংখ্যালঘুর সম্পত্তি দখলের দিকে মনোযোগী হয়।

এখানে কয়েকটি কথা সবিনয়ে জানাতে চাই। বাংলাদেশে একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে তারা সংখ্যায় বাড়ছে কেন, কখন, কীভাবে একটি দখল-দারির মনোবৃত্তি ও তাদের ভূমিকার ফলে রাজনীতি-প্রশাসনসহ সমাজে একটি দখলদারির সংস্কৃতি গড়ে উঠল, তা আমাকে অনেক দিন ধরে ভাবাচ্ছে। এ প্রবণতা মজ্জাগত হয়ে পড়েছে কি না এবং তার ব্যাপকতা কতখানি তা আরও গভীর পর্যবেক্ষণের বিষয়, তবে তা যে উদ্বেগজনক পর্যায়ে ও মাত্রায় পৌঁছেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ প্রবণতা বজায় রেখে যেমন গণতন্ত্র চর্চা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় স্বাধীনতার মতো কোনো অর্জনকে রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য ফলপ্রসূ করে তোলা।

রাষ্ট্রের সহযোগিতায় প্রধানত হিন্দুদের এ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, প্রান্তিক অভাজন এবং অসহায় সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে। ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের আইনসভা এমন দুটি আইন পাস করে, যাতে সংখ্যালঘুদের মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়ে। এ আইন দুটি হলো—ইস্টবেঙ্গল প্রিভেনশন অব ট্রান্সফার অব প্রোপার্টি অ্যাণ্ড রিমুভেবল ডকুমেন্টস অ্যাণ্ড রেকর্ডস অ্যা* অব ১৯৫২ এবং ইস্ট পাকিস্তান ডিস্টার্বড পারসনস (রিহ্যাবিলিটেশন) অর্ডিন্যান্স অব ১৯৫৪। এ আইনগুলোর ফলে সরকারি অনুমতি ছাড়া সংখ্যালঘুরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি বিক্রির অধিকার হারায়। ১৯৫৭ সালে জারিকৃত 'পাকিস্তান (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব ইভাকুইজ প্রোপার্টি) অ্যা* দ্ধঢঢ অব ১৯৫৭' এবং ১৯৫৯ সালে সামরিক শাসক আইউব যখন ছয়জন বিশিষ্ট সংখ্যালঘু নেতাকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করেন। ছড্রচড্ডথঙ্গ তখন আরেকবার হিন্দুরা উপলব্ধি করে রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকা তাদের প্রতি কতটা বৈরী ও আক্রমণাত্মক।

১৯৬৫ সালের স্বল্পস্থায়ী পাকিস্তান ভারত যুদ্ধের প্রতিফল হিসেবে প্রণীত হয় দীর্ঘস্থায়ী শত্রু সম্পত্তি আইন, যা প্রায় নির্বিচারে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কালাকানুন এখনো অর্পিত সম্পত্তি আইন নামে বহাল রয়েছে। '৬৪ সালের দাঙ্গা এবং '৬৫ সালের যুদ্ধ ও পরবর্তীকালের এই কালাকানুনের কারণে হিন্দুদের দেশত্যাগ বেড়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সরকার, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং

এরপর তিনের পাতায়

দখল-মানসিকতা

(দুয়ের পাতার পর)

তাদের এ দেশীয় দোসরদের দিক থেকে নির্বিচারে সম্প্রদায় হিসেবেই হিন্দুমাত্রই শত্রু হিসেবে বিবেচিত হয়ে তাদের সম্মিলিত সর্বাত্মক হামলার সম্মুখীন হয়। তাই সেদিন প্রায় ৭০ লাখ হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়।

এত বৈরিতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও পাকিস্তান আমলে কি রাজনীতি কি সাংস্কৃতিক সংগ্রামে হিন্দুসহ সব সংখ্যালঘু মূলধারায় যুক্ত ছিল। সেটি ক্রমহ্রাসমান হলেও প্রভাবক ভূমিকায় তখনো ছিল তারা। সবার মতো তাদেরও স্বাধীন বাংলাদেশে সব অন্যায়-অবিচারের অবসান হয়ে সমানাধিকারের ভিত্তিতে কারও অনুকম্পা ব্যতিরেকে মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশও সেই স্বপ্ন রক্ষা তো করেইনি, বরং তাকে ফিকে করেছে, এমনকি ভেঙে দিয়েছে। স্বাধীনতার পরপর পূজামণ্ডপে ব্যাপকভাবে প্রতিমা ভাঙার বিষয়টিকে আমি স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারকে নাকাল করার জন্য পরাজিত পাকিস্তানি পন্থীদের অপতৎপরতা হিসেবে দেখতে রাজি আছি। কিন্তু রাষ্ট্র কী করল? '৭৫-এর পর আবার পাকিস্তানের পথ ধরল, কেবল যে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দেওয়া বা রাষ্ট্রধর্ম বিল পাস হলো তা নয়, কুখ্যাত কালাকানুন অর্পিত সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুর সম্পত্তির বিষয়টি সুরাহা না হয়ে আরও মারাত্মক জটিলতায় পড়ল। ১৯৮৯ সালে ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর এবং ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের প্রাক্কালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আক্রান্ত হয়।

এখন দেশভাগ ও তৎপরবর্তী-কালের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় রাষ্ট্র—প্রথমে পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ—কখনো সংখ্যালঘুর স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার মতো আইন তথা ধর্মীয় বিভেদমূলক অবস্থান থেকে উর্ধ্বে উঠে নাগরিকদের জন্য সমানাধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধার অবস্থানে আসতে পারেনি। পাশাপাশি যখন দেখি সমাজে দুর্বলের সম্পত্তি ভোগদখলের মানসিকতা অব্যাহত রয়েছে, এমনকি তা জাতিগত ব্যাধি হয়ে দাঁড়ানোর উপক্রম হচ্ছে তখন শঙ্কিত না হয়ে পারি না।

বিষয়টা এভাবে কড়া ভাষায় প্রকাশ করার কারণ, দীর্ঘ ৬০ বছরের অবিচার ও অন্যায় সম্পর্কে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় উদাসীন, প্রতিবেশীর নীরব দেশত্যাগ কিংবা সহায়-সম্পত্তি চাকরি-ব্যবসা নিয়ে বৈষম্যের শিকার হওয়া ও নিত্য অপদস্ত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে সংখ্যাগুরু উদাসীন, অসচেতন, নিষ্ক্রিয়। লাখ লাখ মানুষের দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল ও বুকভাঙা হাহাকার পুঞ্জীভূত হতে থাকলে কীভাবে একটি জাতি গর্ব ও আত্মমর্যাদায় সামনে এগোবে। এটা কি সম্ভব? সব ধরনের ভ্রান্তিরই খেসারত দিতে হয়। ঔদাসীন্য, অসচেতনতা, নিশ্চেষ্টতার ফল এই দাঁড়ায় যে আমাদের নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দল (তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের মাধ্যমে) বিজয়কে দখলে রূপান্তরিত করে ছাড়ে এবং রাজনীতি ক্রমে দেশগড়া ও জাতির সেবার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ক্ষমতার বৈভব অর্জনের হাতিয়ার হয়। ছাত্র-যুবকর্মীরা দিকে দিকে হল টেণ্ডার, এলাকা, মার্কেট, ভূমি দখলের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। রঙ্গমঞ্চে নতুন নতুন অধিকতর চতুর ও নিষ্ঠুর দখলদারেরা নেমে পড়ছে, যাদের দুঃসাহস বেপরোয়া মনোভাব, দুর্বৃত্তপনা সকল সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

নতুন দিন আনতে হলে, দিন বদলাতে হলে একটি বড় কাজ হলো—সকল নাগরিকের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিরপেক্ষভাবে সমানাধিকার ও সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। বাঘাই-ছড়িতে দরিদ্র মুসলিমরাও পাল্টা হামলা ও আঘাতের শিকার হয়েছে। তাদের উসকানি না দিয়ে পার্বত্য শান্তিচুক্তির আলোকে ভূমি সমস্যার সমাধান করে সবার মধ্যে আস্থা ও সম্প্রীতি সৃষ্টির লক্ষ্যেই সবাইকে কাজ করতে হবে। তবে তার আগে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমাদের জানতে হবে, এ অঞ্চলে কীভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবিচার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে আর কীভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ দিনে দিনে দখলদারের মানসিকতায় পরিপুষ্ট হচ্ছে ও দখলদারির সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাচ্ছে।

ভুলগুলো স্বীকার করতে হবে এবং শোধরাতে হবে আমাদের।

(সৌজন্যে ঃ প্রথম আলো, ঢাকা)

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন অব্যাহত

* ২৯ মে ২০১০ গভীর রাতে, সাতক্ষিরা জেলার তালা উপজেলার জালালপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা উত্তম কুমার দত্তের বাড়িতে হামলা চালিয়ে লুটপাট করা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রধারী ১৫/১৬ জনের একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত রাত্রি দুইটার সময় হামলা চালিয়ে ওই পরিবারের সোনার গহনা, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য দেড় লাখ টাকা।

*৩০ মে ২০১০ সন্ধ্যায়, ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বলুহর রামচন্দ্রপুর গ্রামের হিন্দু কিশোর বিপ্লব গড়াইকে (১৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে। ওই দিন বেলা একটায় অস্ত্রের মুখে বিপ্লবকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। রাত্রি ১১টার সময় পুলিশ ক্ষতবিক্ষত বিপ্লবের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

* ২৯ মে ২০১০, সকালবেলা, নোয়াখালী জেলার লক্ষীপুর উপজেলার চর চামিতা বাজারে হিন্দু মুদি দোকানের মালিক, স্বপন চন্দ্র কুরি কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্বৃত্তরা দোকানের মালপত্র লুটের পর স্বপনকে এলোপাথাড়ি ছুরিকাঘাত করে।

* ২৮ মে ২০১০ গভীর রাতে, বাগের হাট জেলা শহরে হিন্দু বাসিন্দা মিলন সাহার বাড়িতেকতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ২৫ ভরি স্বর্ণালংকার সহ নগদ একলাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে।

* সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার নাপিডাটিলা এলাকায়, অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ বসবাসকারী ৩৫টি আদিবাসী পরিবারকে তাদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের অপচেষ্টা শুরু হয়েছে। মহসীন আলী নামক এক মুসলিম দুর্বৃত্ত উক্ত টিলার সাত একর ৩৫ শতক জমি তার নিজস্ব সম্পত্তি বলে দাবি করে উক্ত জমিতে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে। এলাকার বাসিন্দা লক্ষী ত্রিপুরা (৮০), মঙ্গরং ত্রিপুরা (৪০) ও রামরায় ত্রিপুরা (৫১) জানিয়েছেন, অবিলম্বে উক্ত টিলা ছেড়ে চলে যাবার জন্য আদিবাসীদের ওপর হামলাও হয়েছে।

* ২ জুন ২০১০, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার সালন এলাকার এক আদিবাসী খ্রীস্টান যুবককে (৩০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

* ২ জুন ২০১০ রাতে, পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার রনগোপালদী ও যৌতা এলাকায় আওয়ালী লীগের সাংসদ গোলাম মওলা মদতপুষ্ট—কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত স্থানীয় হিন্দুদের ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। বাড়ি ঘর ভাংচুর ও লুটপাটের ফলে হিন্দুরা সর্বহারা হয়ে পড়েছে। হামলা-কারীদের প্রহারে হিন্দু বাসিন্দা জয়দেব দেবনাথ (৩০), দিগেন্দ্রনাথ দেবনাথ (৩২), শীতল দেবনাথ (২৮), নির্মল হালদার (৩৫) ও শ্রীমতি রেণুবালা দেবনাথ (৬০) গুরুতর আহত হয়েছেন।

* ৩ জুন ২০১০ গভীর রাতে, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনার গাঁ উপজেলার সিংলাব গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সুদেব চন্দ্র বিশ্বাসের বাড়িতে ব্যাপক হামলা চালায় সালহ আহাম্মেদের নেতৃত্বে একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা একটি মন্দির, পাঁচটি প্রতিমা, বাড়িঘর ভাংচুর সহ লুটপাট করেছে। গৃহকর্তা সুদেব চন্দ্র বিশ্বাস, দেবী রাণী বিশ্বাস ও কমলা রাণী বিশ্বাসকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে ৩০ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

* ২ জুন ২০১০, সাতক্ষিরা জেলার আশাশুনি উপজেলার নয়াবাদ গ্রামের হিন্দু দশম শ্রেণীর ছাত্রী পারুল মণ্ডলকে প্রকাশ্য রাস্তায় জাপটে ধরে মুসলিম দুর্বৃত্ত বেল্লাল হোসেন অশালীন আচরন করে। অপমানিত পারুল বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনায় পারুলের বাবা রঞ্জন মণ্ডল বাদী হয়ে ১০ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

* ২১ মে ২০১০ রাতে, মানিগকঞ্জ পৌরসভার পুড়ড়া এলাকায় নীলকমল রায়ের নির্মাণাধীন হিন্দু বাড়ির হিন্দু তত্ত্বাবধায়ক, দীনহরি বর্মনকে (৪০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে।

* ১ জুন ২০১০ সন্ধ্যায়, নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামের দরিদ্র হিন্দু বাসিন্দা পরেশ চন্দ্র সূত্রধরের কন্যা প্রতিমা রাণী সূত্রধরকে, প্রতিবেশী মুসলিম দুর্বৃত্ত নয়ণ মিয়া আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরন করে নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে থানায় মামলা করায় অপহরণকারীরা সূত্রধর পরিবারকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

* ৭ জুন ২০১০, শিক্ষক নিয়োগে প্রতারনা, অনিয়ম ও ঘুষ দুর্নীতির প্রতিবাদে চরম ঘৃণা জানিয়ে বিষ পানে আত্মহত্যা করলেন হিন্দু মহিলা রেনুকা রাণী মণ্ডল। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা লুৎফর রহমান এক লাখ টাকা ঘুষ নিয়েও রেনুকা দেবীর সাথে প্রতারনা এবং প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে আতংকিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় উক্ত মহিলা। বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার আমবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

* ২০০৭ সালে জাতিসংঘের লোকগণনা অনুসারে সমগ্র পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ৬৬৭ কোটি ১২ লাখ ২৬ হাজার। এ জনসংখ্যাকে ধর্মীয় জনগোষ্ঠি হিসাবে বিভাজন করতে গিয়ে দেখা যায় খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সমগ্র পৃথিবীতে ১১১টি রাষ্ট্রে খ্রীস্টানদের সংখ্যা ২১৯ কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩২ দশমিক ৯৩ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মুসলিমরা। ৪৫টি রাষ্ট্রে মুসলমানদের মোট সংখ্যা ১৪৩ কোটি ১৫ লাখ ৪০ হাজার ৬৪২ জন। মোট জনসংখ্যার ২১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে হিন্দুরা। ভারত, নেপাল ও মরিশাসসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে হিন্দুদের সংখ্যা ৯৭ কোটি ৪৭ লাখ ৫৪ হাজার ৭৭২ জন। মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ। জাপান, চীন, তাইওয়ান, কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, তাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, তিববত, ভুটান ও নেপালসহ বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বৌদ্ধদের মোট জনসংখ্যা ৪৯ কোটি। মোট জনসংখ্যার ৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ। এর পরবর্তীস্থানে রয়েছেইহুদী জনগোষ্ঠি। ১৫৮ কোটি ৮০ লাখ ৪৪ হাজার ৫৮৬ জন মানুষের কোন

এরপর চারের পাতায়

জিজিয়া কর

সুনীল আচার্য

'বিয়ে করবো না' বললেও শেষ পর্যন্ত হারু সর্দার বিয়ে ক'রে বসলো। কনে দুলি। দেখতে কালো। তবুও সুন্দরী। তার রূপের ছটায় হারু মুগ্ধ। সংসার যে এত মধুর হারুর আগে জানা ছিল না! আগে কাজকর্মে মন লাগত না। খেতে ভালো লাগত না। কেমন সব লাগত। আর এখন সবকিছুতে প্রাণ পায়। খুশিতে ডগমগ থাকে সব সময়। তার দিনগুলো আবার স্বপ্ন। তার রাতগুলো আবার উষ্ণ। শুধু ঘোরে ঘোরে থাকা। পাখি ডাকে। বাতাস ওঠে। গাছে গাছে পাতা নড়ে। হারুর মনে এসব কিছুই প্রাণের কথা বলে। দুলি তার জীবন ছন্দে-গানে ভরিয়ে দিয়েছে।

হারুর ছোট সংসার। তেমন ঝুট-ঝামেলা নেই। মা-বাবা, সে আর দুলি। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আছে। মাঠে কিছু জমি আছে। ভাত-কাপড়ের চিন্তা করতে হয় না। বাড়ির সঙ্গে ছোট বাগান। তাতে আম-জাম-কাঁঠাল-সুপুরি-নারকেল গাছ। মশুমের ফল পেয়ে যায়। ছোট পুকুর আছে। তাতে মাছ। বাঁশঝাড় আছে। বিপদে-আপদে, সংসারের প্রয়োজনে তা বিক্রি করে সামাল দেয়। আসলে হারুরা কৃষিজীবী। চাষবাসই তাদের ভোরণ-পোষণের একমাত্র ভরসা। আশপাশের গ্রামও তাই। তারা মুসলমান। কিন্তু ব্যবহারে তারা দুর্বৃত্ত সমান। সুযোগ পেলেই হিন্দুদের ফসল, পুকুরের মাছ চুরি করে নেয়। কখনও কখনও ঘর-বাড়ি লুট করে নেয়। কখনও কখনও হিন্দুদের গ্রামে চড়াও হয়ে ভয় দেখায়। হারুর এটাই ভালো লাগে না। সুখের মাঝেও বিষের কাঁটা বুকে ফোটে। নির্বিঘ্ন জীবন মাঝে মাঝে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। গ্রামের লোকজন 'কোথাও যাব না' বললেও স্থির থাকতে পারে না! চলমান রাজনৈতিক হাওয়া তাদেরকেও অস্থির করে দেয়। পুজাপাঠ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে হলে মুসলমানদের অনুমতি নিতে হয়। অলিখিত একটা সামাজিক পরাধীনতা হারুকে বেঁধে রাখে। দমবন্ধ পরিবেশে থাকতে হয়। ভেবেছিল ইণ্ডিয়াতে গিয়ে বিয়ে করে নতুন ঘর-সংসার পাতবে। সেখানে তো এসব নেই। কথায় কথায় মালোয়ান বলবে না। জিনিসপত্তর বিক্রি করলে সব দাম পাওয়া যায় না। মোল্লাদের মর্জির উপর নির্ভর থাকতে হয়।

ছমির উদ্দীন মোল্লার কথা মনে আসে। এক সময়ে ছমির উদ্দীন ওদের শরিকানা জমি বর্গাচাষ করতো। প্রথম প্রথম কিনা ব্যবহার। ফেরেস্তাকেও হার মানায়। আর এখন, ভাগের ফসল তো দেয়ই না, জমিতে গেলে উল্টে তাড়া করে।

এরপর চারের পাতায়

জিজিয়া কর

(তিনের পাতার পর)

‘খুন করে ফেলবো’ বলে ভয় দেখায়। জোর যার জমি তার হারু এখন বোঝে। থানা-কাচারি করেও লাভ হয়নি! শেষে গ্রামের মাতববর ফলুমিয়া হারুকে বুঝিয়েছে, ‘শোন বাপু, পানিতে বাস করবা, আর কুমিরির সাথে বিবাদ করবা, তাতো হয় না। এখন জমি ছমির উদ্দীনের। তার মর্জি হলি সব পাবা। না হলি না।’ হারু চুপচাপ থাকে। বিবেকের তাড়না যাদের নেই—তাদের সঙ্গে কি আর কথা বলবে। ফলুমিয়া আবার বলে, ‘শোন বাপু, হ্যানে থেকে লাভ কি? ইন্ডিয়া তুমাদের দ্যাশ, স্যানে চলে যাও। কি মধুতে হ্যানে পড়ে থাকো!’ ফলুমিয়া ভাষণ আর উপদেশ নীরবে শোনে হারু। মুখে রা নেই। ভেতরে ভেতরে কষ্ট, ক্ষোভ আগুন হয়ে ওঠে। বেটার ভাত জুটতো না। আর এখন ফুলেফেঁপে উঠেছে। হিন্দুদের ঘর-বাড়ি-জমি জবরদখল করে এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ। গ্রামের মাতববর। হারুর ইচ্ছে হয়, ‘শালার কাটাকে দু’ঘা বসিয়ে দিই। বড় বাড় বেড়েছে।’ কিন্তু এ পর্যন্তই মনের ইচ্ছে, রাগ বেশি ক্ষণ স্থায়ী হয় না। তার আগেই সান্ত্বনার বৃষ্টি জলে শীতল হয়। সব মুছে যায় ঘরে ফিরে দুলির কথায়, হাসিতে, যত্নে!

বিয়ের পরে পরেই হারু শহরতলীতে একটা দোকান দিয়েছে। কাপড়ের। সেখানে প্রতিদিন যায়। বিক্রিবাটা খারাপ না। তাছাড়া সেখানে গ্রামের গ্রাম্যতা নেই। সবাই তাকে বাবু বাবু বলে। দিনটা বেশ ভালই কেটে যায়। দুপুরে বাড়িতে খেতে আসে। আবার সন্ধ্যায় দোকানে ফিরে যায়। রাত সাতটা পর্যন্ত দোকানদারি করে। শহরতলী থেকে বাড়ি কুড়ি মিনিটের পথ। সে হেঁটেই যাতায়াত করে।

বাড়িতে বাবা-মা আর বউ। এখন সংসারের কাজকাম সব দুলিই করে। ঘরের কাজ করে। রান্নাবান্না করে। জল আনতে নদীতে যায়। গ্রামে কোন পুকুর নেই। নলকূপও নেই। নদীর জলই পান, স্নান, রান্নাবান্নার ভরসা।

সেদিন দুপুরে রান্না শেষ করে শ্বশুরকে খেতে দেবে ভেবে কলসিতে হাত দিতেই দেখে শূন্য। জল নেই! সর্বনাশ, যেতে হবে সেই নদীতে। ভর দুপুর। রাস্তা ফাঁকা। যে যার কাজে ব্যস্ত। কলসি কাঁকে নিয়ে শাশ্বড়িকে বলল, ‘মা, জল আনতি যাচ্ছি। নদীতে।’

‘সাবধানে যাস্ মা। যা দিনকাল পড়েছে।’ পথে মোল্লাছেলেগুলো থাকে। দেখেশুনে যাস্।’

‘ঠিক আছে মা।’

ঠিক আছে বললেও দুলি ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়। এ সময় নদীতে যাবার রাস্তা ফাঁকা থাকে। তার উপর এই চড়া রোদে এতোটা চর ভেঙে নদীতে নামতে হবে। চরে যাবার পথে দু’পাশে বেগুন গাছের ক্ষেত। কচি কচি বেগুন ঝুলে আছে। কি সুন্দর রঙ। পাখি ডাকছে। ফিঙে, চড়াই, ঘুঘু। মন কেমন করে ওঠে। হারুর মুখটা মনে পড়ে। বেচারা এই রোদে বাড়িতে খেতে আসবে। পথের অন্যপাশে প্রাণঠাকুরের আমবাগান। এখন কোন এক মোল্লা কেড়ে নিয়েছে। তবু লোকে ঠাকুরের বাগানই বলে। আম-কাঁঠাল গাছ এত ঘন হয়ে আছে যে তাকাতে ভয় হয়। তবু সবুজ এতো আকর্ষণ করে যে দুলি না তাকিয়ে থাকতে পারে না! এসব দেখতে দেখতে বেশ দ্রুত পায়েই সে নদীর দিকে যাচ্ছিল। আর দু’মিনিট হাঁটলেই নদীর কূল। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন তাকে জাপটে ধরলো। মুখ ঘোরাতেই কে যেন মুখ চেপে ধরলো। কিছু বোঝার আগেই দু’জন ছোকরা তাকে বেগুন ক্ষেতের দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো। হাত-পা ছুঁড়ে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়েও তাদের রোধ করতে পারলো না! চিৎকার করতেও পারলো না। গামছা দিয়ে ওরা মুখ বেঁধে ফেলেছে। একজন তাকে মাটিতে ফেলে হাত-পা বেঁধে ফেলল তারই শাড়ি দিয়ে। অন্যজন তাকে জাপটে ধরলো হিংস্র বাঘের মতো। তারপর বেদনা, যন্ত্রণা, কামড়, ধবস্তাধবস্তি। তারপর তার জ্ঞান হারালো। ভয়ে, ঘৃণায়, ধিককারে! নদীর ওপাড়ে থেকে কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। ঠিক বুঝতে পারছিল না। তবু সে চিৎকার করলো, ‘ওগো, কে কুথায় আছো! কার বউকে টেনে নিলো। কার বউকে টেনে নিলো।’...সে আওয়াজ নদীর এপাড়ে পৌঁছালো না। ভর দুপুরের বাউরা-বাতাসে মাঝ নদীতেই হারিয়ে গেল।

দুলির জ্ঞান যখন ফিরলো দেখলো সে ঘরে শুয়ে আছে। বাড়িময় কেমন থমথম আবহাওয়া। ছোটগ্রাম। কয়েকঘর হিন্দু। তারাও ভয়ে ভয়ে বোবা হয়ে গেছে। এমন অবস্থা হলে তো বসবাস করা দায়। দুলি শুনলো—শ্বশুর-শাশুড়ি আর পাড়ার কয়েকজন ফিসফিস করে বলছে—কসাই পাড়ার দুই ছোকরা এ কাজ করেছে। হারু থানায় গিয়ে নালিশ করায়—পুলিশ ওদের ধরে নিয়ে গেছে। এর ফল কি হবে—ভেবে সবাই আতঙ্কিত।

আতঙ্কে আতঙ্কে, লজ্জায় দিনের সূর্য ডুবে গেল। সন্ধ্যা হলো। ব্যথায় ক্ষোভে হারুর কাছে এ রাতটা আরো গভীর। হারু দোকানে যায়নি। কারুর দুপুরের খাওয়া হয়নি। এমন বিপদ। সম্মান খুঁইয়ে বসে আছে। হারু দুলির পাশে বসে ঝিমুচ্ছিল। ঘরের পাশের বাঁশঝাড়ে হঠাৎ রাতকানা পেঁচা তীব্র ডেকে উড়ে গেল। তার ডানার শব্দে হারু সজাগ হয়ে উঠল। মমতার চোখে দুলিকে দেখে। দেখতে দেখতে মন ক্ষোভে আগুন—‘শালাদের দেখে নেব।’

এমন সময় দশবারোজন লোক দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। হাতে তাদের মাংস-কাটার দাঁ। মুখ কাপড়ে বাঁধা। চেনার উপায় নেই। মৃদু হারিকেনের আলোতে ভূত দেখার মত হারু বোবা। নিথর। প্রথমেই হারুকে মারধোর করে। হারুর বউকে লাথি মারে। তারপর একে একে ঘরের জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিতে থাকে। জামাকাপড়, থালা বাটি, বাক্স, এমনকি বউয়ের গলা থেকে সোনার চেনটাও খুলে নেয়। হারু চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। হঠাৎ পান্ডা মুখ খুলে বলে, ‘যা করতিছি, ঠিক করতিছি। শালা, মালায়ন! এবার জরিমানা হিসেবে জিজিয়া কর নিয়া গেলাম। যাতে তুদের আক্কেল হয়! এদেশে থাকবি। খাবি। আর জিজিয়া কর দিবি না!

সর্বস্ব নিয়ে একে একে দুর্বৃত্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই দুলি কেঁদে ওঠে। এ কান্নার শব্দ নেই। শুধু যন্ত্রণা ছাড়া। হারু পাথরের মতো নির্বাক বসে থাকে। কি হবে? এভাবে কি বাঁচা যায়! মা-বাবা উঠে পড়ে। ‘চল—তৈরি হয়ে নে। যা আছে তা নিয়েই গ্রাম ছেড়ে চলে যাই।’

হারু বলে, ‘কুথায় যাবা?’

‘ইন্ডিয়াতে।’

ঘরের মেঝে খুঁড়ে সঞ্চিত অর্থ-গয়না হারু একটা পুঁটুলিতে বেঁধে নেয়। ঘর-বাড়ি বিক্রি করা যাবে না। কেউ কিনবেও না! বিক্রি করতে গেলে টাকাও পাবে না। বাবা-ঠাকুরদার ভিটে থাক—এমনই পড়ে থাক। দুলিকে ধাক্কা দিতেই উঠে পড়ে। সারা শরীরে ব্যথা। হাঁটতে পারবে তো! তবু বাঁচার আশায় ওরা অন্ধকারে চুপি-চুপি পথে নেমে পড়ে। সম্বল শুধু হাত-পা আর কিছু সঞ্চিত টাকা-গয়না। পথে যেতে যেতে হারু দেখে অনেক দূর চলে এসেছে। হঠাৎ তীব্র রাগে সে ফুঁসে ওঠে, ‘না, এভাবে পালাইয়ে বাঁচা যায় না! আমি এর বদলা নেবো।’ তারপর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে দ্রুত অন্ধকারে ছুটে যায়। মা-বাবা আর দুলি নির্বিকার। তারা স্থূল পুতুলের মত গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে!

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

(তিনের পাতার পর)

ধর্মীয় বিশ্বাস নাই। এসব মানুষ ক্ষুদ্র জাতি সত্বার। বৌদ্ধ/শিখ/জৈন এবং হিন্দুরা এক হতে পারলে সংখ্যা হবে ১৪৬ কোটি ৪৭ লাখ ৫৪ হাজার ৭৭২ জন। তাহলে হিন্দু জনসংখ্যা হবে পৃথিবীর দ্বিতীয়।

* পাকিস্তানের লাহোরের সংখ্যালঘু আহমদিয়া সম্প্রদায়ের দুটি মসজিদে ইসলামী সন্ত্রাসীদের হামলায় কমপক্ষে ৮০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৭ পুলিশসহ ১০৮ জন। গত ২৮ মে শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় মসজিদ দুটিতে এই ভয়াবহ হামলা চালানো হয়। সন্ত্রাসীরা একে-৪৭ রাইফেল, গ্রেনেড ও বোমা নিয়ে একযোগে হামলা চালায়। সাম্প্রতিক সময়ে এটিই পাকিস্তানে সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা।

* গ্রামের নাম আল-কায়েদা। পশ্চিম ইয়েমেনের পর্বতসংকুল পাহাড়ি এলাকার ছোট্ট একটি গ্রামের নাম। আলকায়েদা প্রধান ওসামা-বিন-লাদেনের পূর্বপুরুষের বাড়ি। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই হতদরিদ্র এবং শান্ত। পাসপোর্টে আল-কায়েদা নাম উল্লেখ থাকলেও অন্য দেশের ভিসা পেতে কোন অসুবিধা হয় না।

* বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদেশী মুদ্রার মোট যে পরিমান রিজার্ভ রয়েছে, তার ৩০ দশমিক ৭০ শতাংশই চীনে। ২০০৯ সালে শেষের দিকে হিসাব অনুসারে দেশটিতে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরিমান ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি ডলার।

* পার্বত্য চট্টগ্রামে ভিটে বাড়ি হারা এক লাখ উদ্বাস্তু পরিবার এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এসব সংখ্যালঘু আদিবাসী পরিবারের পুনর্বাসনের কথা বলা হলেও বেদখল হওয়া বাড়ি জমি এখনও বাংলাদেশ সরকার উদ্ধার করতে পারেন নাই। ভারত প্রত্যাগত চাকমা শরনার্থীরা ফের তারা ভারতে ফিরতে চাইছে। কারণ তাদের জমি বাড়ি সমতল থেকে আসা মুসলিমরাই দখল করে রেখেছে। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাঘাইছড়ি এলাকায় মুসলিমরা হামলা চালিয়ে আদিবাসীদের ৫০০ বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। হামলাকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনী গুলি চালিয়ে সাত আদিবাসীকে হত্যা করে। এর পরই আদিবাসীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

* বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এর বদলে যুক্ত করা হয়েছে ‘অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ।’ গত ৩১ মে, একবছর ধরে আলোচিত জাতীয় শিক্ষানীতি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। খসড়ায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি উল্লেখ করায় ইসলাম অনুসরণকারী রাজনৈতিক দলগুলি প্রশ্ন তোলেন ও আন্দোলন শুরু হয়। ফলে তথাকথিত প্রগতিশীল আওয়ামী লীগ সরকার ধর্মীয় অনুভূতির কথা বিবেচনা করে কাঁঠালের আমসত্ব উপহার দিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঘুরিয়ে ইসলামকেই গুরুত্ব দেওয়া হলো বলে মানুষ মনে করছেন।

* বাংলাদেশী সংখ্যালঘুদের ভারতে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের একটা হিড়িক পড়েছিল। দেশের মাটিতে তাদের জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা নেই গত ছয় দশক যাবত্। তাই ভারত মুখী গতি তাদের। চতুর বিত্তবান সংখ্যালঘুরা কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গোপনে বাড়ি, ফ্ল্যাট, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করে রেখেছিল। কিন্তু বিধি বাম হয়েছে, ২০০৩ সালে ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন, ভারতে আর কোন বাংলাদেশী নাগরিকত্ব পাবে না। নাগরিকত্ব না থাকলে সম্পত্তি, ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা পয়সা সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই গোপনে সম্পত্তি বিক্রি করে, ব্যাংকের টাকা তুলে নিয়ে চতুর পাতিকাকরা পাড়ি জমাচ্ছে বাংলাদেশেই। এখন উল্টো স্রোতের হিড়িক পড়েছে।

* যোগ্য জবাব পেয়েছে আওয়ামী লীগ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে। তাদের প্রার্থী মহিউদ্দিন পরাজিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গোলধাম মন্দিরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জমি লুটের ব্যবসা শুরু করেছিল মহিউদ্দিন মিয়া। ক্ষুব্ধ হিন্দু ভোটাররা মহিউদ্দিনের গণেশ উল্টে দিয়েছে ভোট ব্যালটে। এখনও দেশজুড়ে পাইকারী সংখ্যালঘু উৎপীড়ন চলছে। উৎপীড়নকারীরা অধিকাংশই আওয়ামী লীগের বান্দা। সংযত না হলে সমগ্র বাংলাদেশেই আগামী দিনে সংখ্যালঘুরা শনি নাচিয়ে দিতে পারে আওয়ামী লীগের কপালে বলে শোনা যাচ্ছে।

সমাজের চোখে অনেকদিন ঠুলি দেওয়া চলে না।.... সর্বংসাহা ধরিত্রীর মতো সমাজ অনেক সহ্য করে, কিন্তু একদিন না একদিন জেগে ওঠে এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগ যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতা রাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। —স্বামী বিবেকানন্দ

প্রকাশক, মুদ্রক —সুভাষ চক্রবর্ত্তী, ৮৫ এ পি সি রোড, কোলকাতা-৯, প্রধান কার্যালয় ঃ স্কুলপাড়া, শ্রীখণ্ডা, কোলকাতা - ১৫২ কর্তৃক প্রকাশিত
আনন্দ প্রিণ্টার্স, ৩/১সি মোহনবাগান লেন কোলকাতা - ৪ হইতে মুদ্রিত
সত্বাধিকারী ও সম্পাদক ঃ সুভাষ চক্রবর্ত্তী
ফোন নং ঃ ৯২৩৯৭৬৯৯৩৮